২ বিশেষ প্রবন্ধ
দলিত
জীবন ও সংগ্রাম

রোহিত ভেমুলার মৃত্যু ও তৎপরবর্তী ছাত্র আন্দোলন

প্রবীন থাল্লাপেল্লি*

রোহিত ভেমুলার আত্মবলিদান এবং উত্তরকালীন ছাত্র আন্দোলন

রোহিত ভেমুলার মৃত্যু পরবর্তী ছাত্র আন্দোলন; ব্যাপারটা নিয়ে কিছু বলতে যাওয়া বা লিখতে যাওয়াটা একটা অদ্ভুত স্ববিরোধ নয়? আমি যে জন্যে ব্যাপারটাকে স্ববিরোধ বলতে চাইছি তা হল ছাত্র আন্দোলন রোহিত ভেমুলার জন্য কী করেছিল যখন তিনি বেঁচে ছিলেন এবং ছাত্র আন্দোলন কী করল তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক হত্যা বা মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে? আমি শুধুমাত্র আলোচনা করব রোহিত ভেমুলার মৃত্যু পরবর্তী ছাত্র আন্দোলন প্রসঙ্গে, শিরোনামে যেমনটি বলা হয়েছে।

স্কেচ: শিপ্রা দে

ছাত্র আন্দোলন সব সময়ই ছিল — রোহিতের জীবদ্দশায়, তাঁর মৃত্যুর আগে বা পরে। কিন্তু রোহিত পরবর্তী ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। সারা ভারত জুড়ে যে ছাত্র আন্দোলন চলেছিল এই সময়ে তা দানা বেঁধেছিল মুলত একটি প্রশ্নে — বিশ্ব বিদ্যালয়গুলোতে দলিত, আদিবাসী ও অনগ্রসর শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত পরিস্থিতি কেমন। অন্য কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, এটা ছিল একটি আম্বেদকরীয় ছাত্র আন্দোলন যা ইতিহাসে প্রথম সংঘটিত হল। এর আগে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে সারা ভারত জুড়ে ছাত্র আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে। ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হল এবং দেশ জুড়ে এর পক্ষে ও

বিপক্ষে ছাত্র আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। প্রায় পঁচিশ বছর পরে আমরা দেখলাম আর একটি ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন যা সংঘটিত হয়েছিল রোহিত ভেমুলার মৃত্যুর ন্যায়বিচারের দাবিতে। অনেক মানুষ রোহিত ভেমুলার সঙ্গে নিজেদেরকে একাত্মবোধ করেছিলেন। কারণ রোহিত তাঁর শেষ চিঠিতে যা লিখেছিলেন তা যেন তাঁদেরই কথা। রোহিত তাঁর চিঠিতে প্রকাশ করেছিলেন তাঁদেরই অনুভূতি, তাঁদেরই গল্প যা ঘটে চলে তাঁদের জীবনজুড়ে। প্রত্যেকটি সংবাদপত্র রোহিতের এই একমাত্র চিঠিটি প্রকাশ করেছিল। দূরদর্শনের চ্যানেলগুলো এটি সম্প্রচার করেছিল। হাজার হাজার মানুষ সমাজমাধ্যমে এই চিঠিকে শেয়ার করেছিলেন।

২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ জানুয়ারিতে যে প্রতিবাদ কর্মসূচি নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা ভারতে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন দিক সূচিত করে। পরের দিনের সব সংবাদপত্রের প্রথম পাতা জুড়ে ছিল আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের খবর। ওয়াসিম নামে একজন ছাত্রকে দেখা যায় পুলিশি বেষ্টনীর বাইরে আম্বেদকরের প্রতিকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। এটা ভারতের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে একটা বিশেষ লক্ষণ। আমি বলব রোহিত ভেমুলার ন্যায়বিচারের জন্য আন্দোলনের মাঝে এ যেন আম্বেদকরের উজ্জ্বল উপস্থিতি। অবশ্য আম্বেদকরীয় ছাত্র আন্দোলনের পূণর্মূল্যায়ন দরকার এবং তাকে আম্বেদকরের ভাবধারা এবং প্রস্তাবের সঙ্গে সাযুজ্য রাখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আসা দলিত, আদিবাসী, অনগ্রসর এবং সংখ্যালঘুরা রোহিত ভেমুলার জন্য ন্যায়বিচারের দাবিতে পথে নেমেছিলেন। শীঘ্রই অনেক ছোট ও বড় শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলো নাগরিক সমাজ ও বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারি গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে একযোগে জয়েন্ট এ্যাকশন কমিটি গঠন করেছিল। রোহিত ভেমুলার ন্যায়বিচারের জন্য গঠিত এইসব জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটিগুলোর মধ্যে যথেষ্ট ভালো সমন্বয় ছিল না। হায়দ্রাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি সহযোগিতার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উদাসীন ছিল, সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখানো ছাড়া। দিল্লি চলো অভিযান সঠিকভাবে পরিকল্পিত ও রূপায়িত হচ্ছে কিনা দেখার জন্য মুম্বাই জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির সদস্যগণ দিল্লিতে এসেছিলেন।

উল্লিখিত প্রতিবাদ আন্দোলনগুলোর ক্ষোভের হেতু হল এই যে খুব কম সংখ্যক তফশিলি জাতি, তফশিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার সুযোগ পান। আর যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পান তাঁদেরকে বিভিন্ন রকম প্রাতিষ্ঠানিক আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে অবিচার, বৈষম্য ও প্রত্যাখ্যান প্রতিনিয়ত ঘটে তার প্রতিকারই হল রোহিত ভেমুলা আন্দোলনের মূল কথা। এই আন্দোলনের মধ্য থেকে যে দাবিগুলো উঠে এসেছিল তাদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি হল রোহিত অ্যাক্ট, যে আইন মোতাবেক প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এস.সি.এস.টি. এবং ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের জন্য সেল (cell) থাকবে এবং তাঁদের জন্য ইসুয়্যাল অপরচুনিটি সেলও রাখতে হবে। এই সেলগুলো এটা নিশ্চিত

করবে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ তাঁদের কাছে অনুকূল ও পক্ষপাতশূন্য। একই সঙ্গে এই দাবি ছিল যে পাঁচজন ছাত্রের সাসপেনশন তুলে নিতে হবে।

দিল্লি চলো অর্থাৎ মার্চ টু দিল্লি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি। আম্বেদকর ভবন থেকে যন্তরমন্তর পর্যন্ত সারা পথ জুড়ে বিশাল র‍্যালি বেরিয়েছিল যে র‍্যালিতে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ছাত্রছাত্রীরা যোগদান করেছিলেন। রাধিকা ভেমুলা, রাজা ভেমুলা (রোহিত ভেমুলার মা ও ভাই), প্রকাশ আম্বেদকর এবং অন্যান্য অনেক ব্যক্তি এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। র‍্যালি শেষে যন্তরমন্তরে যে জমায়েত হয়েছিল সেখানে বালচন্দ্র মুঙ্গেরকর, বৃন্দা কারাত, রাহুল গান্ধী, অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রমুখ জাতীয় স্তরের নেতৃত্ব এবং সারা ভারতবর্ষ থেকে আসা অনেক ছাত্র নেতা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। যদিও রোহিতের জন্য খুব বেশি কিছু তাঁরা করেননি। আম্বেদকরীয় ছাত্রনেতাগণ, যাঁদের মধ্যে ছিলেন দোস্থা প্রশান্ত, শেষের দিকে এই জমায়েতে বক্তব্য রেখেছিলেন। রাধিকা ভেমুলা ছিলেন দিনের শেষতম বক্তা। দুঃখের বিষয় হল, তাঁকে বলতে দেওয়া হয়েছিল একেবারে গোধূলিবেলায় যখন জমায়েতে ভিড় পাতলা হয়ে গিয়েছিল। আমি মনে করি, রোহিত ভেমুলার জন্য দিল্লি চলো অভিযান একটি বিরাট ব্যর্থতা। কারণ আম্বেদকরীয় ছাত্র আন্দোলন দিল্লিকে ২০১৬তে অনাবশ্যক গুরুত্ব দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, তারা বিজেপি সরকারের স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছোঁড়ার সুযোগ হারিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠীগুলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গজিয়ে উঠেছে দীর্ঘদিন ধরে, তাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ নেওয়ারও সুযোগ তারা হারিয়েছিল। দিল্লি চলো অভিযানে এত মানুষের যে সমাগম হয়েছিল তার প্রাপ্তি কী তা বৃহত্তর জনগণের কাছে স্পষ্ট নয়। ছাত্র আন্দোলন বা বৃহত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে দিল্লি চলো অভিযান কোনও প্রভাব ফেলেনি। যাই হোক, রোহিত ভেমুলা ছাত্র আন্দোলন বা দলিত জনগোষ্ঠীর উপর এক সুদূরপ্রসারী ছাপ নিশ্চিতভাবে রাখতে পেরেছেন।

যে চিঠি রোহিত লিখেছিলেন তা যে শুধু দলিত, আদিবাসী বা প্রান্তিক মানুষজনের মনের কথা তা নয়, তা সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের মনের কথা বলে। ঠিক সেইজন্যই মানুষ চিঠিটার বিষয়বস্তু নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে। সেইজন্যই আজকের দিনেও মানুষ এই চিঠিটার কথা বলে। রোহিতের প্রাতিষ্ঠানিক মৃত্যুর পাঁচ বছর পরেও মানুষ তাকে মনে রেখেছে, তার সঙ্গে নিজেদেরকে একাত্ম করতে পারে। এর কারণ হল রোহিতের কথাগুলো ছিল সবার কথা। রোহিতের মৃত্যু পরবর্তী ছাত্র আন্দোলন ভারতীয় ছাত্র সমাজের মধ্যে একটা নতুন ভাবধারা সঞ্চারিত করেছিল যে ভাবধারার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তথাগত গৌতম বুদ্ধ, মহাত্মা ফুলে, বাবাসাহেব আম্বেদকর, মান্যবর কাঁসিরাম, থানথাই পেরিয়ার প্রমুখ নেতৃত্ববর্গ।

রোহিতের মৃত্যুর আগেও আম্বেদকর স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (এ.এস.এ) ছিল, রোহিতের মৃত্যুর পরেও ছিল। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে চুণ্ডুরু গণহত্যা এবং মণ্ডল কমিশনের

সুপারিশ লাগু হওয়ার পরে পরেই এই সময়ে হায়দ্রাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এ.এস.এ. প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সারা দেশ জুড়ে এই ছাত্র সংগঠন খ্যাতি পেয়েছিল। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আম্বেদকরীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছাত্রছাত্রীরা এ.এস.এ-র শাখা খুলেছিলেন। ছাত্রছাত্রীরা এবং আপামর জনগণ আম্বেদকরীয় ভাবধারায় নিজেদেরকে একাত্ম করেছিলেন এবং এটা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে।

২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে মোদির নেতৃত্বে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর সরকার রোহিত ভেমুলার জন্য প্রথমবার বেকায়দায় পড়েছিল। লক্ষ্ণৌতে বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন মোদি সমাবর্তনে ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন রাম কারনান নির্মল এবং অমরেন্দ্র আর্য নামে দুই ছাত্র মোদির ভাষণের বিরোধিতা করেছিলেন এবং তাঁকে কালো পতাকা প্রদর্শন করেছিলেন। উত্তরে মোদি বলেছিলেন, ভারত কা লাল মর গয়া অর্থাৎ ভারতের সন্তান মারা গিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই দুই ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। অবশ্য পরে তা তুলে নেওয়া হয়।

২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে লোকসভায় বিজেপি প্রথমবার স্বীকার করল যে তারা একটা ভুল করেছে। যখন বহুজন সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো মায়াবতী লোকসভায় রোহিত ভেমুলার প্রাতিষ্ঠানিক মৃত্যুর বিরুদ্ধে বলতে উঠলেন তখন স্মৃতি ইরানিকে স্বীকার করতে হয়েছিল যে তিনি একটি ভুল করেছেন। অবশ্য স্মৃতি ইরানি রোহিতকে একজন শিশু হিসাবে সম্বোধন করেছিলেন। এর অর্থ হল স্মৃতি ইরানি রোহিতকে একজন চিন্তাশীল যুক্তিবাদী মানুষ এবং ছাত্র আন্দোলনকারী ছাত্র নেতা হিসাবে দেখতে চাননি। যাই ঘটুক না কেন, রোহিত ভেমুলা সংক্রান্ত আন্দোলন বিজেপিকে বিপাকে ফেলেছিল। এই প্রথমবার বিজেপি একজন মন্ত্রীকে দীর্ঘদিন দায়িত্বে থাকা এক মন্ত্রক থেকে অন্য মন্ত্রকে সরাতে বাধ্য হয়েছিল। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক থেকে স্মৃতি ইরানিকে সরতে হয়েছিল বস্ত্রশিল্পমন্ত্রকে।

পরবর্তী কুড়ি পঁচিশ দিনের মধ্যে ২০১৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারিতে জেএনইউতে একটা ঘটনা ঘটেছিল। অবশ্য এটি ছিল মৃত্যুদণ্ড বিরোধী একটি আন্দোলন। এই আন্দোলনে যাঁরা সংগঠনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, আমি মনে করি, রাজনীতিতে তাঁরা কাঁচা। এই প্রথমবার জেএনইউতে আম্বেদকরীয় ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছিল। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে কয়েকজন মিলে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে একটা কর্মসূচি আয়োজন করল। বিজেপি যেভাবে চায় সেভাবেই তারা তা করেছিল। এটি একটি পৃথক বিষয় যে সংগঠকদের একজনের সঙ্গে আমি সহমর্মিতা পোষণ করেছিলাম যখন তিনি কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। জেএনইউ শিক্ষক সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্রিডম স্কোয়ারে জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতার ওপর এক বক্তৃতা মালার আয়োজন করেছিলেন। পরে সেগুলো একটা বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয় (বইটির শিরোনাম: What the Nation Needs to Know)। সত্য ঘটনা হল এই যে জনগণ এই বক্তৃতাগুলো শুনতে চায় না। যাইহোক জেএনইউ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন জনগণের উপর তাঁদের মত চাপিয়ে দিয়েছিল। তাঁদের বক্তার মধ্যে নতুন বা মহান কিছুই ছিল না। জাতীয়তাবাদের উপর ভাষণ তো মানুষের পেট ভরায় না। মানুষ শান্ত হয় তখন

যখন তাদের খিদে মেটে, তারা কাজ পায়, তাদের কাজ পাওয়ার সুযোগ থাকে। জেএনইউ এর বিদগ্ধ ছাত্রশিক্ষকগণ যাই তাঁরা বলে থাকুন না কেন তা তাঁরা বলেছিলেন নিজেদেরকে প্রাসঙ্গিক রাখার তাড়নায়। আবেগের বা তাড়নার বশবর্তী হয়ে তাঁরা যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা আম্বেদকরীয় আন্দোলন অর্থাৎ ২০১৬ সালে রোহিত ভেমুলার ন্যায়বিচার আন্দোলনকে এটা ছন্দ বা গতি (break) দিয়েছিল। ওই বছর মার্চ মাসে হায়দ্রাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা রোহিতের ন্যায়বিচারের একই দাবি নিয়ে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন এবং পরে মুক্তও হয়েছিলেন। কিন্তু সংবাদমাধ্যম আচ্ছন্ন ছিল জেএনইউ-এর ছাত্র আন্দোলনের ব্যাপারে। ২০১৬ সালে হায়দ্রাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলন চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় আসলে যা ঘটে। যেসব দলিত ছাত্রাছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসেন তাঁদের প্রতি যে প্রত্যাঘাত বা বৈষম্য ঘটে এবং এই ব্যাপারে ছাত্র শিক্ষকগণের ভূমিকা কী হয়, ছাত্র রাজনীতিই বা কী ভূমিকা নেয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনই বা কী ভূমিকা গ্রহণ করে। আর আজকের দিনে, ধরা যাক ২০২১ সালে, দলিত, আদিবাসী ও অন্যান্য অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে ভয় পান না। কারণগুলোর মধ্যে একটি হল রোহিত ভেমুলা আন্দোলন। এখন দলিত, আদিবাসী ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে গেলে মানুষ একটু ভয় পায়। জেএনইউ ছাত্র আন্দোলনে নতুন একটা স্লোগান এসেছে — জয় ভীম লাল সেলাম। এটা ছিল একটা অবশ্যম্ভাবী স্লোগান যা তৈরি হয়েছিল বাস্তবের তাড়না থেকে। জয় ভীম লাল সেলাম — অন্যভাবে আমি এই নতুন স্লোগানকে বলতে পারি একটি বিরোধালঙ্কার (oxymoron)। আম্বেদকরের চিন্তাভাবনায় শ্রমিকশ্রেণি আছেন। তাঁর নিজের কথায় 'জাতিভেদ হল শ্রমিকদের বিভাজনের ফল।' আম্বেদকর শ্রম ও শ্রমিকদের সম্বন্ধে ব্যক্ত করেছেন তাঁর চিন্তাভাবনা তাঁর রচনা 'অ্যানিহিলেশন অব কাস্ট'-এ। তিনি আমাদেরকে বলেছেন যে আমাদের দুটি শত্রু— ব্রাহ্মণ্যবাদ ও ধনতন্ত্র। এর সঙ্গে তিনি পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধেও সরব ছিলেন। আম্বেদকর যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে লেনিন যদি ভারতে জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে তিনি জাতিভেদ প্রথা নির্মূল করতেন এবং বিপ্লব আনতেন।

২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জেএনইউতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হল। ঠিক এর পরেই হায়দ্রাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচন ছিল। জেএনইউ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল, বীরসা আম্বেদকর ফুলে স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন বা বাপসা (BAPSA) এই দ্বিতীয়বার নির্বাচনে এককভাবে লড়াই করেছিল এবং জেএনইউতে এক সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র সংগঠন হয়ে উঠেছিল। উল্লিখিত নির্বাচনে, এবিভিপি এবং লেফ্ট ইউনিটি উভয়েই বাপসার বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছিল। সুতরাং আমি এখানে বিনীতভাবে প্রশ্ন রাখতে চাই — জয় ভীম লাল সেলাম স্লোগানের অর্থ কী রইলো? কেন লেফ্ট ইউনিটি - বাপসাকে জোটের জন্য আমন্ত্রণ জানায়নি এবং ঘোষণা করেনি যে বাপসা এবং লেফ্ট ইউনিটি একসাথে এবিভিপি'র বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং এবিভিপিকে

শেষ করবে? গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নটা বাপসা এই নির্বাচনে রেখেছিল তা হল ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদেরকে ছাত্র হিসাবেই দেখা হোক এবং সেক্ষেত্রে কোন বৈষম্য বা এই ধরনের কিছু যেন না থাকে। দেড় হাজারের বেশি ভোট পেয়ে সভাপতি প্রার্থীপদসহ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে জেএনইউতে বাপসা জয়লাভ করেছিল। এর অর্থ হল জেএনইউ এর ছাত্রছাত্রীরা বাপসাকে দায়িত্ব দিতে চেয়েছিল।

২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে হায়দ্রাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন সংঘটিত হয়। এখানে আম্বেদকর স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন সংক্ষেপে এ.এস.এ স্বাধীনভাবে (জোট ছাড়া) লড়াই করেছিল। বহুজন স্টুডেন্টস্ ফেডারেশন, দলিত স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন এবং ট্রাইব্যাল স্টুডেন্টস্ জোট গড়েছিল স্টুডেন্টস্ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া বা এস এফ আই-এর সঙ্গে। এবিভিপি ছিল তৃতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী। বি.এস.এফ.আই পরিচালিত জোট নির্বাচনে জয়লাভ করেছিল। সভাপতি পদের জন্য এ.এস.এ নিয়ে গঠিত এস.এফ.আই পরিচালিত জোট নির্বাচনে জয়লাভ করেছিল। সভাপতি পদের জন্য এ.এস.এ শুধু নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল এবং দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিল। যখন রোহিত ভেমুলার ন্যায়বিচারের জন্য সমস্ত বহুজন সমাজ একযোগে আন্দোলন করছিল তখন এ.এস.এ কেন বি.এস.এফ, ডি.এস.ইউ এবং টি.এস.একে ত্যাগ করল এবং এককভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল? এটা এমন একটি গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্ন যা তোলা দরকার। আবার যে এস এফ আই জে এন ইউতে বাপসার সঙ্গে জোট বাঁধেনি সেই এস এফ আই কীভাবে এইচ সি ইউতে বি এস এফ, ডি এস ইউ এবং টি এস এ-র সঙ্গে জোট বাঁধল? এটি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

যদি রোহিত ভেমুলা হায়দ্রাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনের একজন নেতা হন এবং যদি এ এস এ রোহিত ভেমুলার নামেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকে তাহলে এ এস এ এই এইচ সি ইউ তে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করতে কেন পারল না? আমাদেরকে ভাবতে হবে, তারা যদি অধৈর্য হয়ে থাকে তাহলে কীজন্য এবং কিসের বিরুদ্ধে তারা অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। এ এস এ গঠিত হয়েছিল ১৯৯০ সালে এবং তার পঁচিশ বছরের ইতিহাসে সে পেয়েছে রোহিত ভেমুলার মতো ছাত্রকে যিনি ভাবতেন, পড়াশোনা করতেন, লেখালেখি করতেন এবং এবিভিপি ও এইচ সি ইউ-এর নির্মম প্রশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন। কেন তাঁর মৃত্যু ঘটতে দেওয়া হল যখন এটা জানা গেল যে তিনি মৃত্যু নিয়ে ভাবছেন এবং তাঁর মতামত ব্যক্ত করছেন (মৃত্যু নিয়ে তিনি ফেসবুকে পোস্ট করেছিলেন)। এর মানে কী? ছাত্র আন্দোলনের নামে কী চলছে? বাবাসাহেব আম্বেদকর সংঘবদ্ধ সমাজ বা সমিতির কথা বলেছিলেন। এএসএ নিজের নামকরণ করেছিল বাবাসাহেব আম্বেদকরের নামে (আম্বেদকর স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন)। আম্বেদকরীয় শব্দ 'অ্যাসোসিয়েশন'-এর কী অর্থ রইল এএসএ-র কাছে? 'অ্যাসোসিয়েশন' শব্দটির অর্থ হল সংযুক্তি, একটা সংযুক্ত জীবন যাপন এবং একসাথে সমস্যাকে বোঝার চেষ্টা করা ও উপলব্ধি করা। প্রশ্ন হল এই সমানুভব জীবন যাপন এসএএ-র ক্ষেত্রে ঘটত কিনা। আমি বিশ্বাস করি, সংযুক্ত জীবনযাপন রোহিত ভেমুলার জীবনে

ঘটেনি, তাই তিনি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। এইচসিইউতে রোহিতের আগে অনেক পড়ুয়া প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যের কারণে মারা গিয়েছেন। আমি ভাবি তাঁরা রোহিতের মত এত খ্যাতি পেলেন না কেন। যেটা রোহিতকে বিখ্যাত করেছিল সেটা হল তাঁর চিঠি এবং মানুষ নিজেদেরকে ঘটনাটির সঙ্গে একাত্ম করেছেন। পরের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে (এইচসিইউ-তে) এএসএ জোট বেঁধেছিল বিএসএফ, ডিএসইউ এবং টিএসএ-র সঙ্গে জোট না করে এককভাবে এএসএ-র নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অর্থ হল দলিত, আদিবাসী এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। দলিত, আদিবাসী এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষ রোহিতের ন্যায় বিচারের জন্য কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন। এএসএ এই সমস্ত আন্দোলন ও জনাদেশ এর সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ করেছিল। তাদেরকে অসম্মানিত করেছিল। রোহিত ভেমুলার জন্য লড়াইতে প্রতিবাদ করার আম্বেদকরীয় দাবি থাকা সত্ত্বেও এসএ সহযোগী আম্বেদকরীয়, বহুজন দলিত ও আদিবাসী ছাত্র সংগঠনগুলোকে প্রত্যাঘাত করেছিল। এএসএ বিশ্বাসভঙ্গ করেছিল বিভিন্ন জেএসি (জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি)-র সঙ্গে। এই কমিটিগুলো কিছু ক্ষেত্রে এএসএ এবং এইচসিইউ-র সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল। কোন কোন সময় যোগাযোগ রাখা হয়নি। কিন্তু তারা সবাই রোহিতের ন্যায় বিচারের জন্য মানুষকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল।

২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাজিব আহমেদ নিখোঁজ হয়ে গেল। এবিভিপি তাকে জোর করে অদৃশ্য করে দিয়েছিল। জেএনইউ-এর ছাত্রছাত্রীরা কি সম্পূর্ণ সহানুভূতির সঙ্গে নাজিবের ন্যায়ের জন্য লড়াই করেছিল? নিশ্চয়ই তারা তা করেছিল দিল্লির পথে পথে। কিন্তু নাজিব কোন ন্যায় বিচার পেল না কেন? মুসলমান পড়ুয়ারা তাদের মতাদর্শসহ কি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করতে পারে? আমার বক্তব্য হল ২০১৭ সালে জেএনইউ ছাত্রসংসদ নির্বাচনে বাপসা'র সভাপতি পদ প্রার্থী হয়েছিলেন সাবানা আলি নামে একজন আম্বেদকরপন্থী মুসলমান মহিলা এবং জেএনইউ ক্যাম্পাস তাঁকে ভোট দেয়নি। এখন প্রশ্ন হল আমরা কেমন করে ছাত্র আন্দোলনকে বিশ্বাস করব। একই সঙ্গে প্রান্তিক ও সংখ্যালঘুদের স্বার্থের প্রশ্নে ছাত্র আন্দোলনের মধ্যেই অস্পষ্টতা রয়েছে।

২০১৬ সালের ইউজিসি গেজেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রূপায়িত হল এবং আসন (seat) সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হল সংরক্ষণনীতি লঙ্ঘন করে। বাপসার এবং সামাজিক ন্যায় রক্ষাকারী সক্রিয় কর্মীরা সরাসরি আকাদেমিক কাউন্সিল মিটিং-এ ঢুকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এই জন্যে তাঁদেরকে ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। এই সাসপেনশনের বিরুদ্ধে এই ছাত্ররা একটা কমিটি গঠন করেছিলেন যার নাম ছিল কমিটি অব সাসপেন্ডেড স্টুডেন্টস্ ফর সোস্যাল জাস্টিস্। তাঁরা ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জেএনইউ-র অ্যাডমিনিসট্রেটিভ বিল্ডিং-এ একটি অবরোধ কর্মসূচি সংগঠিত করেছিলেন এবং যার ফলে তাঁদেরকে ঐ বছর অক্টোবর মাসে বহিস্কার করা হয়।

মুপু কৃষ্ণণ ছিলেন রোহিত ভেমুলা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী একজন ছাত্র। ২০১৭

সালের মার্চে তাঁর মৃত্যু সবাই এর কাছে একটা বড় প্রশ্ন চিহ্ন রাখল। হায়দ্রাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে (এইসিইউ) রোহিত ভেমুলার ন্যায়ের জন্য আন্দোলনে মুথু অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ২০১৬ সালের মার্চে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ও অন্দোলনকারী কর্মীদের সঙ্গে জেলে গিয়েছিলেন। তিনি 'এ ইউনিভার্সাল মাদার উইদাউট এ নেশন' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যা খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রাধিকা ভেমুলার লড়াইকে তুলে ধরেছিল। ২০১৬ সালের জুলাই মাসে তিনি জেএনইউতে যোগ দিয়েছিলেন। কেন মুথু নিজের জীবনকে শেষ করে দিয়েছিলেন যখন তিনি নিজেই রোহিত ভেমুলার জন্য ন্যায় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন সক্রিয়ভাবে এবং যিনি রোহিতের মায়ের যন্ত্রণাকে ব্যক্তিগতভাবে চাক্ষুষ করেছিলেন। দিল্লি এইমস্-এ পোস্ট মর্টেম-এর পর দিল্লি পুলিশ মৃতদেহ দিল্লি বিমানবন্দরে নিয়ে যায় যেখান থেকে মৃতদেহ বিমানে করে চেন্নাইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখান থেকে যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। ২০১৭ সালের ১৬ মার্চে বাপসা মুথু কৃষ্ণণের মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রতিবাদসভার আয়োজন করেছিল যেটাকে আমি অভিহিত করেছিলাম একটা 'আনটাচেবল প্রোটেস্ট' হিসাবে। যে জন্যে এটা অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সেগুলো হল:

১) একজন দলিত ছাত্রের মৃত্যুর পরেও জেএনইউ তার দৈনন্দিন কাজকর্ম ও পঠনপাঠনসহ সাংঘাতিকভাবে স্বাভাবিক ছিল।

২) মুথু কৃষ্ণনের মৃত্যুর জন্য কোনরকম দুঃখ বা অনুতাপ দেখা যায়নি জেএনইউতে।

৩) তখনও মুথুর মৃত্যুপরবর্তী আচার অনুষ্ঠান শেষ হয়নি, তার আগেই জেএনইউ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন একটি শোকসভার আয়োজন করেছিল (তখনও মুথুর মৃতদেহ এইমস-এর মর্গে ছিল)।

৪) কর্তৃত্বপরায়ন জেএনইউ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রিত গুজব সৃষ্টিকারী মেশিনারি কিছু যুক্তিহীন নোংরা গুজব ছড়িয়েছিল মুথুর নামে। মুথুর দিকে নোংরাভাবে কাদা ছুঁড়েছিল এবং মৃত্যুর পড়েও তাকে রেহাই দেয়নি। আমি আগে বলেছি এবং আবার বলছি যে ২০১৬ থেকে ২০১৭ সালের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত রোহিত ভেমুলার নামটি আরো বেশি আলোচিত হয়েছে এবং শ্রুত হয়েছে সেই সব অন্যান্য অ্যান্টিকাস্ট চিন্তাবিদ, নেতা ও দার্শনিকদের চেয়েও বেশি, যাঁদের মধ্যে বাবাসাহেব আম্বেদকরও আছেন। আম্বেদকরীয় দর্শনে বিশ্বাসী যে কারুর থেকে রোহিত বেশি প্রশংসিত হয়েছে। রোহিতের উপর যা ঘটেছে এবং আমরা তার জন্য কী করেছি সেই বিষয়ে যদি কিছু বলতে বলা হয় বা বিতর্ক হয় তাহলে আমি সবসময় প্রস্তুত আছি। তিনি প্রশংসিত বা বিখ্যাত শুধু তাঁর মৃত্যুর জন্য। অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুই তাঁকে প্রশংসিত ও বিখ্যাত করেছে, তাঁর রাজনৈতিক যাত্রা বা কাজকর্ম বা আদর্শের জন্য মানুষ তাঁকে মনে রাখেনি।

মুথুর মৃত্যু জেএনইউ-র আম্বেদকরপন্থীদের (যেমন বাপসা) দিকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিল। তারা (বাপসা বা অন্যরা) দলিত, আদিবাসী, অনগ্রসর শ্রেণী এবং সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের জীবন রক্ষার জন্য কী করেছিল? কেন জেএনইউ-এর মত একটা

প্রগতিশীল পরিসর মুথুকে বাঁচাতে পারল না?

২০১৭ সালে বিএইচইউ (বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়) এর মহিলা পড়ুয়ারা বিএইচইউ এর নির্মম নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ আন্দোলন চালিয়েছিলেন। তাঁরা বিএইচইউ এর লঙ্কা গেটে প্রতিবাদসভার আয়োজন করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোকটর এবং অন্যান্য পদাধিকারিকদেরকে মোকাবিলা করা এবং সামনাসামনি লড়াই করা বেশ চমকপ্রদ।

২০১৮ সালে জেএনইউ প্রশাসন ইউজিসি গেজেট আবার চালু করল যা আসন (seat) সংখ্যা কমায়, সংরক্ষণনীতিকে লঙ্ঘন করে এবং শতকরা একশো ভাগ মৌখিক পরীক্ষা (ভাইভা ভোসি) কার্যকর করে এবং উল্লিখিত পরীক্ষা ব্যবস্থায় তা ছিল এস.সি, এসটি এবং ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের কাছে বৈষম্যমূলক। ২০১৮ সালের মার্চের শেষ ভাগ থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাপসা জেএনইউ এর স্কুল বিল্ডিংগুলো অবরোধ করে রেখেছিল। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে হঠাৎ করে যে রোস্টার সিস্টেম চালু হয়েছিল তার বিরুদ্ধে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে এবং দিল্লির পথে পথে লাগাতার প্রতিবাদ হয়েছিল।

রোহিতের মৃত্যুর পরবর্তী আন্দোলনে যেটা পাওয়া গিয়েছিল সেটা হল দলিতদের জন্য একটু আধটু স্বীকৃতি। কিন্তু দলিত বা জাতপাত সংক্রান্ত কোন আলোচনা বা বিতর্ক বা আম্বেদকরের আদর্শ এবং দর্শন নিয়ে আলাপ আলোচনার পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর কাছে আম্বেদকর এবং তাঁর ভাবধারার স্বীকৃতি বা গ্রহণযোগ্যতা দেখা গেল না।

২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে রোহিত ভেমুলার ন্যায় আন্দোলনের কোন প্রভাব দেখা গেল না। এর কারণ বলতে গেলে বিশেষ করে বলতে হয় যে রোহিত ভেমুলার মৃত্যুর পর যাঁরা নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, যেমন দোস্থা প্রশান্ত, সুকন্ন, রাহুল সোনপিম্পলে প্রমুখ, তাঁদের একজনও রোহিত ভেমুলার নামে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। তাঁরা এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন, পড়াশুনা করছেন। এর মানে কি এই নয় যে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চান এবং লোকসভা ২০১৯ এর মতো নির্বাচনে তাঁরা বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে তাঁরা নিজেদেরকে যুক্ত করতে চান না। তাঁরা নির্বাচন-রাজনীতি করতে চান বা চান না — এটাই একটি খোলা প্রশ্ন। আমরা এখানে সূক্ষ্মভাবে বিচারবিশ্লেষণ করতে পারি দু'জন ছাত্রনেতার কথা যাঁরা আম্বেদকরীয় ও বামভাবাদর্শের মধ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

২০১৯-এ অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে এএসএ (আম্বেদকর স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন)-র পেদ্দিপুজি বিজয় কুমার (ইনি রোহিত ভেমুলা, দোস্থা প্রশান্ত, ভেলুপুলা সুকন্ন এবং সেশু চেমুডুগন্তি প্রমুখ ছাত্রনেতাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত হয়েছিলেন) এমএলএ পদপ্রার্থী হিসাবে বিএসপি-র টিকিটে লড়াই করেছিলেন। ভাগ্যের পরিহাস হল এই যে রোহিত ভেমুলার নাম করে যেসব নেতারা আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তাঁদের কেউই তাঁকে সমর্থন করেননি এবং এমনকি কোন সহমর্মিতাও দেখাননি। তাঁর জন্য কোন ক্রাউড ফান্ডিং এর ব্যবস্থা করা হয়নি। সমাজ মাধ্যম তাঁর হয়ে কোন প্রচার

করেনি।

জেএনইউতে ইউজিসি গেজেটের বিরুদ্ধে অনেকে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন। যখন বীরেন্দর কুমার ঝাড়খণ্ড থেকে লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়ালেন তখন কোথায় ছিলেন সামাজিক ন্যায় আন্দোলনের কর্মীরা? বিজয় কুমার বা বীরেন্দর কুমার তাঁদের থেকে কোন সমর্থন কী পেয়েছিলেন?

জনগণ এখনও ভাবেন যে রোহিত ভেমুলার পরে একমাত্র ছাত্রনেতা হলেন মি. কান্হাইয়া কুমার। আম্বেদকরের সময়েও, কিছু ব্যক্তিকে তাঁর বিরুদ্ধে নেতা হিসাবে সুপরিকল্পিতভাবে তুলে ধরা হয়েছিল। রোহিতের ন্যায় বিচারের জন্য যখন আম্বেদকরপন্থী ছাত্র আন্দোলন চলছিল জেএনইউতে তখন মি. কানহাইয়া কুমারকে তুলে ধরা হল একজন নায়ক হিসেবে। রোহিত ভেমুলার জন্য ন্যায় আন্দোলনের অভিমুখকে ঘুরিয়ে দেওয়া বা আন্দোলনের তীব্রতাকে লঘু করে দেওয়ার জন্য এটি হল আরএসএস (রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ)-এর একটি কৌশল। জাতি ও জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গ চাপিয়ে দেওয়া হল আমাদের সবার উপরে যাতে ধীরে ধীরে রোহিত ভেমুলা আন্দোলনের মৃত্যু ঘটে এবং যাতে প্রান্তিক ও সংখ্যালঘুদের ভিতর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কোন দাবি না ওঠে এবং যাতে বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে ব্রাহ্মণ্যবাদের আস্তানা (অগ্রহর) যেখানে প্রান্তিক বা অস্পৃশ্যদের কোন প্রবেশাধিকার নেই। জেএনইউ এর কিছু পড়ুয়া সম্পূর্ণরূপে বিজেপি ও আরএসএস-এর হয়ে মাঠে নেমেছিলেন এবং তাঁরা রোহিত ভেমুলা আন্দোলনকে বিপথগামী বা লঘু করে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। একজন ছাত্র যদি জাতি ও জাতীয়তাবাদ নিয়ে সত্যিকারের ভাবতে চায় তাহলে তাকে জানতে হবে জাতি ও জাতীয়তাবাদ নিয়ে আম্বেদকরের ভাবধারা। আম্বেদকর তাঁর রচনা 'স্টেট অ্যান্ড মাইনরিটিস' এবং 'পাকিস্তান অর পার্টিশন অব ইন্ডিয়া' তে পরিস্কার বলেছেন যে 'স্টুডেন্ট ইজ দি স্টুডেন্ট অব দি প্রবলেম'। আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় স্ববিরোধ হল, আমি বিশ্বাস করি, জাতিভেদ।

২০১৯ এ জেএনইউ-তে বিশাল এক আন্দোলন হয়েছিল ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে। বাপসা ও লেফ্ট গ্রুপ জেএনইউ প্রশাসনের বিরুদ্ধে দিল্লির পথে পথে প্রতিবাদ আন্দোলন করেছিল। তীব্র ছাত্র আন্দোলনের ফলে সরকার নত হতে বাধ্য হয়েছিল। দিল্লি হাই কোর্টের মধ্যস্থতায় সরকারকে আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের দাবিগুলো শুনতে হয়েছিল।

ছাত্র আন্দোলন সিএএ এবং এনআরসি এর বিরুদ্ধে লড়াই করার একটা বিরাট সুযোগ হারিয়েছিল। তারা সিএএ এবং এনআরসি-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধকে গুরুতরভাবে নেয়নি। বিরোধী দলগুলোও সিএএ এবং এনআরসি-র বিরুদ্ধে গুরুত্বসহকারে আন্দোলন করছে না। অনেকে এটা ভেবে বসে আছে যে সিএএ এবং এনআরসি এর মুল লক্ষ্য মুসলমানরা। কিন্তু আমি বিনীতভাবে আপনাদেরকে বলি যে যখন সিএএ এবং এনআরসি লাগু হবে, দলিত, আদিবাসী, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি এবং মহিলারা বিপদে পড়বেন। কারণ উল্লিখিত ব্যক্তিগণের সম্পত্তি সংক্রান্ত না আছে কাগজ, না আছে কোন নথি। সুতরাং এএসএ,

বিএসএফ, ডিএসইউ এবং টিএসএ প্রমুখ ছাত্র সংগঠনগুলোর উচিত ঐক্যবদ্ধভাবে সিএএ এবং এনআরসি-র বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করা। এক্ষেত্রে একটি বিষয় আমরা স্মরণ করতে পারি। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে যখন গান্ধিজি জাতীয় আন্দোলন করছিলেন তখন বাবাসাহেব আম্বেদকর গান্ধিজিকে বলেছিলেন, "গান্ধিজি, আমার কোন স্বদেশ নেই (Gandhiji, I have no homeland)। এই মুহূর্তে যদি আম্বেদকর বেঁচে থাকতেন তাঁর যে কাজগুলি অগ্রাধিকার পেত সেগুলো হল সিএএ ও এনআর সি-র বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা, লেখালেখি করা এবং মানুষকে সংগঠিত করা।

সামাজিক ন্যায় আন্দোলন কিছু রাজ্যে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়ে চলেছে। সামাজিক ন্যায়ের জন্য আন্দোলনরত ছাত্র সংগঠনগুলোকে এটা মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, আম্বেদকর যা ভারতের সংবিধানে বলেছেন ও নিশ্চিত করেছেন তা হল দলিত, আদিবাসী, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ভারতেরই নাগরিক। নথি দেখিয়ে নিজেদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে বলাটা মানুষকে অপদস্থ ও অপমান করা। বিজেপি তাই করেছে। এই মুহূর্তে সামাজিক ন্যায়ের পক্ষে রাজনৈতিক দলগুলো এবং আম্বেদকরপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলোর দায়িত্ব হল — দলিত, আদিবাসী, অনগ্রসর শ্রেণি, মহিলা, ধর্মীয় সংখ্যালঘুগণ এবং অন্যান্য যে কোন মানুষ যাঁদের ভারতীয় ভূখণ্ডে সম্পত্তি দাবির সপক্ষে কোন কাগজ বা নথি নেই — তাঁদেরকে রক্ষা করা। যদি কোভিড পরিস্থিতি না হত — আমি নিশ্চিত — তাহলে সিএএ এবং এনআরসির বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন হত। কিন্তু তাহলে প্রশ্ন হল, ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকা কী হত। ছাত্র আন্দোলন শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। সিএএ, এনআরসি, এবং বর্তমানে কৃষক আন্দোলনের মতো বৃহত্তর সামাজিক প্রশ্নগুলোর প্রেক্ষিতে তাকে সাড়া দিতে হবে। রোহিত ভেমুলা কবিতা ও ফেসবুকে লেখালেখিতে নিজেকে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়গুলোতে আবদ্ধ রাখেননি। মত্যুদণ্ড, জাতিভেদ এবং অন্যান্য সামাজিক বিষয়গুলোর সঙ্গেও নিজেকে জড়িয়েছিলেন। রোহিত ভেমুলার মৃত্যু পরবর্তী ছাত্র আন্দোলন বস্তুতঃ কোন বৃহৎ আন্দোলন ছিল না। এর কারণ হিসাবে আমি বলতে চাই, এই আন্দোলন সমাজের চিন্তাধারাকে পাল্টাতে পারেনি। এই আন্দোলন মানুষের বিশ্বাসে চিড় ধরাতে পারেনি। এই ছাত্র আন্দোলন সমাজের চিন্তাধারাকে পরিবর্তন করতে পারেনি কারণ সমাজেরই রয়েছে জাতপাতসংক্রান্ত বিভেদমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। ছাত্র আন্দোলনের কাছে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ছাত্রকে শুধু ছাত্র হিসাবেই দেখা। তাকে কোন অন্য পরিচিতির (identity) সঙ্গে যুক্ত করা বা তার জাত কী তা দেখা সমীচিন নয়। ঘটনা হল যে জাতপাতের পরিচয় এখন ছাত্র নির্বাচনগুলোতে প্রধান বিষয় হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত পড়ুয়াকে মানুষ হিসাবে দেখা গুরুত্বপূর্ণ। রোহিত তার শেষ চিঠিতে এটা দাবি করেছিল যে 'একজন মানুষকে 'মন' বা 'চিন্তা' হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। এখনও পর্যন্ত ভারতে কোন মানুষকে একজন চিন্তাশীল, যুক্তিবাদী এবং স্বাধীন চেতনাসম্পন্ন মানুষ হিসাবে বিবেচনা করা হয় না, দেখা হয় না বা বিচার করা হয় না। যদি একজন ছাত্র নিজের পরিচিতি বা আইডেন্টিটি রাখতে চায় তাহলে ছাত্রসমাজ

তাকে তার পরিচিতি-র সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করতে পারে। কিন্তু যদি কোন ছাত্র এই ধরনের কোন পরিচিতি না চান তাহলে তাঁকে শুধু মানুষ হিসাবে বিচার করতে হবে এবং কোনরকম আইডেন্টিটির ছাপ তাঁর গায়ে সাঁটানো ঠিক নয়। একজন ছাত্রের মনন রয়েছে। তাঁর মননকে তিনি প্রকাশ করতে পারেন। তাঁর চিন্তাকে তিনি ব্যক্ত করতে পারেন।

রোহিত ভেমুলার মৃত্যু পরবর্তী ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্র আন্দোলনকে খুব বেশি মূল্য দেওয়া যায় না। কারণ তা রাজ্যস্তরের বা জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে কোন পরিবর্তন আনেনি। যাই হোক, এটা স্বীকার করতেই হবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিতে ভেমুলার মৃত্যু পরবর্তী আন্দোলন একটা পরিবর্তন এনেছিল। প্রশ্ন হল এই ছাত্র আন্দোলন (রোহিতের ন্যায়বিচারের জন্য) যা হায়দ্রাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বা জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিঘাত এনেছিল তা কি বুদ্ধ, কবীর, রবিদাস, ফুলে, আম্বেদকর, পেরিয়ার এবং কাসিরামের আদর্শের অনুসারী? অবশ্য এটা উল্লেখ করতেই হবে যে দলিত, আদিবাসী, ওবিসি এবং সংখ্যালঘুদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরী হয়েছে অল্প কিছু ক্ষেত্রে। রোহিত ভেমুলা আন্দোলনের পর, এমন কোন ছাত্র সংগঠন দেখা যায়নি যারা শুধু সম্পূর্ণরূপে আম্বেদকর বা আম্বেদকরবাদকেই তুলে ধরবে। শুধু তাই নয়, আম্বেদকরপন্থী কোন ছাত্রসংগঠনই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে পা রাখেনি। সমাজের সঙ্গে তাদের কোন গভীর এবং নিয়মিত যোগাযোগ নেই। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনকারী দলগুলোর সঙ্গে তাদের কোন গণতান্ত্রিক বোঝাপড়া নেই। এটা পরিলক্ষিত হয় উত্তরপ্রদেশে, বিহারে, মহারাষ্ট্রে, তামিলনাড়ুতে এবং অন্যান্য রাজ্যে। রাজনৈতিক দলগুলো আলাদা পথ নিচ্ছে। আর আম্বেদকরপন্থী রাজনীতি অন্য অভিমুখে যাচ্ছে। তাদের উভয়ের মধ্যে কোন সংযুক্তি নেই, কোন সামঞ্জস্য নেই এবং গণতান্ত্রিক নাগরিক বোঝাপড়া নেই। অথচ থাকা দরকার ছিল কারণ উভয়ের শত্রু এক এবং তা হল ব্রাহ্মণ্যবাদ, ধনতন্ত্র এবং পিতৃতান্ত্রিকতা। ব্রাহ্মণ্যবাদ সুফল পাবে ততদিন যতদিন পর্যন্ত আম্বেদকরপন্থী ছাত্র আন্দোলন এবং বিভিন্ন দলের (যেগুলো চলে আম্বেদকর, বহুজন, দলিত এবং আদিবাসীদের নামে) মধ্যে সমন্বয় না তৈরি হয়। আম্বেদকর যখন বেঁচে ছিলেন, তখন তিনি সিডিউল্ড কাস্ট স্টুডেন্ট ফেডারেশন এবং এলফিনস্টোন স্টুডেন্টস্ কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সামনে বক্তব্য রেখেছিলেন। কোন কারণ নেই কেন যে বিভিন্ন দল যেমন, বিএসপি, ভিসিকে, ভিবিএ এফ জেএমএম, ছাত্ররাজনীতি থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নেয়।

আমি স্বীকার করছি যে আমিও ছাত্র আন্দোলনের অংশ। আমিও নিজেকে ক্ষমা করব না সেই ভুলগুলোর জন্য যেগুলো ছাত্র আন্দোলন করেছিল।

ভাষান্তর : ভাস্কর হালদার